দুর্নীতি বিস্তারে আয়কর ব্যবস্থার ফাঁক-ফোঁকর

আহসান মোহাম্মদ

বর্তমান কেয়ারটেকার সরকারের দুর্নীতি বিরোধী দৃঢ় পদক্ষেপসমূহ দেশের ভিতরে ও বাইরে প্রচুর সমর্থন পেয়েছে এবং বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রকোপ কমিয়ে আনার একটি আশা জাগিয়েছে। তবে দুর্নীতি প্রতিরোধের শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু না করা হলে কিছুদিন পর যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে, তখন দুর্নীতিবাজরা আবারো অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া একদল দুর্নীতিবাজকে দমন করার পর তাদের স্থলে আরেক দলের উত্থান হতে পারে। উন্নত বিশ্বে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য যে সকল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে তার মধ্যে আয়কর ব্যবস্থা অন্যতম। যাদের বার্ষিক আয় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী তাদেরকে প্রতি বছর আয়কর রিটার্ন জমা দিতে হয়। আয়কর রিটার্নের সাথে করদাতাকে তার সকল সম্পদের বিবরণী, সেগুলির অর্থের উৎস প্রমাণসহ দাখিল করতে হয়। ফলে দুর্নীতি, কালোবাজারী, সন্ত্রাস ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত অর্থের মালিক হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থাটিকে সঠিকভাবে কার্যকর করা গেলে দুর্নীতি বিস্তার অনেকাংশেই রোধ করা সম্ভব। কিন্তু বিগত সরকার সমূহ আয়কর ব্যবস্থায় এমন সব ফাঁক-ফোকর রেখেছে যাতে অবৈধ অর্থের মালিকদের সম্পদের মালিক হওয়ার ব্যাপারে কোন বাধাই ছিল না। উপরন্ত বৈধ অর্থের মালিকদের থেকে কালো টাকার মালিকদের করের পরিমাণ ছিল ক্ষেত্র বিশেষে ত্রিশভাগের একভাগ। বর্তমান কেয়ারটেকার সরকার এখনও পর্যন্ত এ সকল ব্যবস্থা বহাল রেখেছে। নীচে উক্ত ফাঁক-ফোঁকরগুলো তুলে ধরা হলোঃ

১. আওয়ামী লীগ সরকার কালো টাকা সাদা করার একটি অদ্ভুত নিয়ম চালু করে। বিধান করা হয়, অবৈধ উপায়ে অর্জিত কালো টাকার শতকরা দশভাগ সরকারী কোষাগারে কর হিসাবে জমা দেয়া হলে তার উৎস নিয়ে কোন প্রশ্ন করা হবে না। বিএনপি সরকার এ বিধানটি বাতিল করার পরিবর্তে কালো টাকা সাদাকরণকে আরও উৎসাহিত করার পদক্ষেপ নেয়। এ জন্য প্রদেয় করের হার শতকরা দশ শতাংশ থেকে কমিয়ে শতকরা সাড়ে সাত শতাংশ করা হয়। অবশ্য ক্ষমতার শেষ বছরে তারা এই বিধানটি বাতিল করে। প্রচন্ড সমালোচনার ঝড় উপেক্ষা করে সরকারসমূহ এ বিধান বহাল রেখেছেন তার কারণ কারো বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। দূর্নীতি, চোরাচালান ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে যাতে বাড়ী, গাড়ী ও অন্যান্য সম্পদের বৈধ মালিক হওয়া যায় সে কারণেই এ বিধান। এই বিধানের ফলে সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেসব করদাতারা যারা আইন মান্য করে নিয়মিত কর পরিশোধ করে; অপরদিকে কর ফাঁকিবাজরা লাভবান হয়েছে। বিষয়টি নিম্নের উদাহরণ থেকে পরিস্কারভাবে বোঝা যাবে।

কোন ব্যক্তির বাৎসরিক আয় বারো লক্ষ টাকা হলে তাকে বর্তমান আয়কর কাঠামোতে তাকে বছরে এক লক্ষ টাকার বেশী মত কর দিতে হয়। বাড়ী ভাড়া, যাতায়াত, সন্তানদের স্কুলের বেতন, চিকিৎসা ব্যয় ও অন্যান্য সাংসারিক খরচ বাবাদ যদি তার মাসে গড়ে ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়, তাহলে তিনি প্রতিবছর ছয় লক্ষ টাকা সঞ্চয় করতে পারেন। এ হিসাবে দশ বছরে তার সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ দাড়ায় ৬০ লক্ষ টাকা। দেখা যাচ্ছে যে, ৬০ লক্ষ টাকার সম্পদকে বৈধ সম্পদ হিসাবে দেখাতে একজন ব্যক্তিকে ১০ লক্ষ টাকা কর দিতে হচ্ছে। তার সাথে রয়েছে মাসে মাসে কর জমা দেয়া ও প্রতিবছর রিটার্ন

দাখিলের ঝামেলা। অপরদিকে কেউ যদি আয়কর না দিয়ে বরং কালো টাকা সাদা করার সুযোগ নিতে চায় তাহলে তাকে ৬০ লক্ষ টাকা সাদা করতে কর দিতে হতো মাত্র সাড়ে চার লক্ষ টাকা।

২. ঘুষ, দুর্নীতি, কালোবাজারী, সন্ত্রাস ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ কেউ মাটির নীচে লুকিয়ে রেখে দিয়ে পর্ণ কুটিরে থাকে না। এ ধরণের অর্থ যে সকল খাতে সব থেকে বেশী ব্যয় হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিলাসবহুল এপার্টমেন্ট ক্রয়। যাতে দুর্নীতিবাজরা তাদের অবৈধ অর্থ নিয়ে কোন ঝামেলায় না পড়ে সে জন্য নিয়ম করা হয়, প্রতি বর্গমিটার হিসাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হলে উক্ত এপার্টমেন্ট ক্রয়ের অর্থের উৎস নিয়ে কোনরূপ প্রশ্ন করা হবে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, অবৈধ অর্থ দিয়ে এপার্টমেন্ট কিনলে যে পরিমাণ অর্থ সরকারকে কর হিসাবে দিতে হয়, যিনি নিয়মিত আয়কর দিয়ে বৈধভাবে অর্থ উপার্জন করেছেন তাকে দিতে হয় তার ত্রিশগুণ কর। তথ্যটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু একটু সামান্য অংক কষলেই এর সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকবে না। যেমন রাজধানীর অভিজাত এলাকায় ২০০০ বর্গফুটের একটি এপার্টমেন্ট ক্রয় করতে রেজিস্টেশন খরচ দিয়ে এক কোটি টাকার বেশী খরচ হয়। এই পরিমাণ টাকাকে বৈধ হিসাবে দেখাতে পূর্বোল্লিখিত হিসাবে ১৭ লাখ টাকা কর দিতে হয়। অপরদিকে প্রতি বর্গমিটার ২০০ টাকা হিসাবে ২০০০ বর্গফুটের এপার্টমেন্টের জন্য সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা কর প্রদান করলে এপার্টমেন্ট ক্রয়ের অর্থের উৎস সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হয না। ফলে ১৫ লাখ টাকার মামলা দুর্নীতিবাজদের জন্য ৪৫ হাজারে মিটে যায়। বর্তমান কেয়ারটেকার সরকার যদি সত্যি সত্যিই দুর্নীতি দমনে আন্তরিক হয়, তাহলে এই ধরণের হটকারী বিধানগুলো অবিলম্বে বাদ দিতে হবে।

৩. দুর্নীতিবাজরা যে তাদের সহায়-সম্পত্তি নিজের নামে বেশী রাখে না তা সকলেই জানা। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা রাখা হয় স্ত্রীর নামে। আয়কর বিধানে শুধুমাত্র করদাতার নামে যে সকল সম্পদ রয়েছে তার হিসাব দেয়ার বিধান রয়েছে। ফলে আয় করের ফাইলের হিসাবে বড় বড় দুর্নীতিবাজরা নিতান্তই দরিদ্র মানুষ। কোটি কোটি টাকার মালিক হয়তো দেখান তাঁর একাউন্টে রয়েছে কয়েক হাজার টাকা। আয়কর বিধান পরিবর্তন করে নিজেদের সম্পদের হিসাবের সাথে করদাদা নন এমন স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পদের বিবরণী দাখিলের নিয়ম করা প্রয়োজন।

আয়কর ব্যবস্থার ফাঁক-ফোঁকরগুলো বন্ধ করা হলে তা শুধু দুর্নীতি প্রতিরোধেই সাহায্য করবে না, বরং রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত স্বয়ম্ভরতা অর্জনেও ভূমিকা রাখবে। আয়কর থেকে প্রাপ্ত আয়ের মাধ্যমে সরকার তার মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা ২০ ভাগের মত পেয়ে থাকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর সাবেক চেয়ারম্যান ও বর্তমান কর ন্যায়পাল বছর দুয়েক আগে বলেছিলেন, আয়কর ব্যবস্থার সংস্কার করলে এ খাতে থেকে প্রাপ্ত আয় পাঁচগুন বেড়ে যাবে। আয়কর থেকে রাজস্ব আদায় যদি সত্যিই পাঁচগুন বাড়ানো যায়, তাহলে শুধুমাত্র এখাত থেকেই অতিরিক্ত ২৫ হাজার কোটি টাকায় রাজস্ব আয় হবে। বর্তমানে আমাদের বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ১৫ হাজার কোটি টাকার মত। ফলে আয়কর দাতার সংখ্যা বাড়িয়ে এবং কর ফাঁকি রোধ করে অতিরিক্ত ২৫ হাজার কোটি টাকা আয় করা গেলে তা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য প্রকৃত অর্থেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। তখন একদিকে যেমন দেশীয় ও বৈদেশিক উৎস থেকে কোন ঋণ নিতে হবে না এবং দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে ঋণের সাথে বেধে দেয়া ক্ষতিকর শর্তসমূহ মানার প্রশ্ন উঠবে না, তেমনি উদ্বৃত্ত অর্থ দেশের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করে সহজেই দারিদ্র বিমোচন ও সকলের জন্য কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা যাবে।